নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রস গল্পটি চল্লিশের দশকের শেষে ১৯৪৭ খ্রীঃ ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং আমাদের মুগ্ধ করে বিষয় বিন্যাসের নানা ঈশারায় মিলে আছে যে সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ। রস গল্পের জন্মসম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ বলেছেন:

".....শীতের দিনে রস থেকে গুড় তৈরীর এই প্রক্রিয়া মা'য়ের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে রোজ দেখতাম। আমার চির চেনা এই পরিবেশ থেকে গল্পটি বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু রসের যে কাহিনী অংশ মোতালেফ মাজুখাতুন আর ফুলবানুকে নিয়ে, যে হৃদয় দ্বন্দ্ব খেজুররসকে ঘিরে, রূপাশক্তির সঙ্গে যে জীবিকার সংঘাত, তা কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আসেনি। সেই কাহিনী দেখিও নি। তা মনের মধ্যে যেন আপনা থেকেই বানিয়ে উঠেছে।"

অথচ কাহিনীর বাস্তবতা না থাকলেও কাহিনী মধ্যে যে খেজুর রস যোগান এবং রস জ্বাল দেওয়ার যে বাস্তব চিত্র আছে, তা তাঁর ছেলেবেলায় পারিবারিক পরিবেশের স্মৃতি সূত্রে সুগভীর প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে। 'রস' গল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র কোন যুদ্ধোত্তর সমাজ সমস্যাকে প্রধান বিষয় করেননি। সম্পূর্ণভাবেই 'মেজাজ রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়' করে রেখেই চিরকালের মানব মানবীর হৃদয় রহস্যের গভীরতম তাৎপর্য সন্ধানী হয়েছেন।

রস গল্পের নায়ক মোতালেফ। মোতালেফ খেজুর গাছ থেকে রস বের করার কাজে একজন দক্ষ গাছি। তার আগের বউ মারা যায়। কার্তিকের খেজুর রস ঘরে আনার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন পড়ে এমন একজনকে যে সুদক্ষ হাতে সেই রস থেকে গুড় এবং গুড় দিয়ে পাটালি করে দেবে। বর্তমানে বিপত্নীক মোতালেফ তাই খেজুর গাছ থেকে দক্ষ হাতে রস বের করার শিক্ষা যে দিয়েছিল, সেই মৃত রাজেক মিধার বিধবা বউ, মোতালেফের থেকে দু তিন বছরের বড় মাজুখাতুনকে বিয়ে করে এনে ঘরে তোলে। মাজু খাতুনের এক মেয়ের বিয়েও হয়ে গেছে। একাই থাকে আগের স্বামীর রেখে যাওয়া

Scanned with CamScanner

ভিটেয়। সব চেয়ে বড় কথা, মাজু খাতুনের রস থেকে গুড় বানানো ও পাটালি করার হাত অসাধারণ।

কাজের জন্য নিয়ে আসা মাজু খাতুনকে; কিন্তু মোতালেক্কের ওই বয়সের প্রেম ও রূপসজ্জার প্রবল আকর্ষণ চরকান্দার এলেম সেখের আঠার-উনিশ বছরের স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ে ফুলবানুর প্রতিই সর্বাধিক। কথাও দিয়ে আসে এলেম সেখকে পরোক্ষে এবং ফুলবানুকে প্রত্যক্ষে টাকা জোগার করে এনে বিয়ে করার। আর শীতের রস থেকে পাটালি ও গুড় করে টাকা আনার একমাত্র সাহায্যকারী মাজুখাতুন ছাড়া কে হবে তবে? মাজুখাতুন যখন স্ত্রী হয়ে থেকে মোতালেক্কের গুড়ের ব্যবসায় বেশ কিছু টাকা এনে দিল, তখনই তাকে একটা বানানো অপবাদ দিয়ে তালাক দেয় মোতালেক। ফুলবানুকে নিকা করে ঘরে আনে। ফুলবানুর সঙ্গে মোতালেক্কের যৌবন স্বপ্নের জীবন এক চরম উদ্দাম উন্মত্ততায় কেটে যায়। এমন বসন্তের জীবনের সুখ তার ধরে না যেন। ফুলবানুকে এতটুকু কষ্ট দেয় না। আদরে-আবদারে রাণীর মতো রাখে। ইতিমধ্যে মাজুখাতুন প্রতিবাদহীন গোপন চাপা ঈর্ষায় জ্বলে। শেষে প্রথম স্বামীর বড় ভাই ওয়াহেদ মুন্সীর যুক্তিতে তালকান্দার নাদির শেখ—যার বয়স এখন পঞ্চাশ কি একান্ন এবং যে গোছের নয়, যার আগের বউ কিছু বাচ্চাকাচ্চা রেখে কলেরায় মারা যাওয়ায় দেখাশুনার লোকাভাব, তাকে বিয়ে করে নদীর পারে তার সঙ্গে চলে যায়।

আগের বউ মাজুখাতুনের এইভাবে চলে যাওয়ায় যেন আপদবিদায়ে ফুলবানু খুশি হয় ভীষণ। কিন্তু তার সুখ-সময় বেশি দিন থাকে না। একবছর ঘুরে আবার যখন শীতের সময় আসে, মোতালেক গাছে রস আনার কাজে আরো ব্যস্ত হয়ে পড়ে, আরো বেশি গাছের দায়িত্ব—তার ওপর আসে। কিন্তু রস থেকে গুড় বানাতে গিয়েই হয় বিপদ। ফুলবানু কিছু জানে না, শেখালেও পারে না। ফুলবানুর চেষ্টার ত্রুটি নেই, কিন্তু মোতালেককে তার গুড়ের ব্যবসায় গত বছরের খ্যাতি এনে দিতে ব্যর্থ হয়। এতেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দেখা দেয় চরম অশান্তি। যে সুন্দরী ফুলবানু মোতালেককে দেহের সুখ থেকে সমস্ত রকম সুখে সুখী করেছিল, গুরুত্বপূর্ণ কাজের দিনে সেই ফুলবানু একেবারে অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। রাগে, দুঃখে হতাশায় মোতালেক ফুলবানুর গায়ে হাত তোলে পর্যন্ত। ফুলবানুর বাব এলেম সেখ এসে মিটমাট করিয়ে দুজনকে শান্ত করে রেখে যায় বটে, তবু তাদের পরস্পরের সম্পর্কে সেই উদ্দাম, তেজ, আসক্তি, উন্মাদনা আর থাকে না।

এই অবস্থায় একদিন বাজারে মোতালেক্কের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় নাদির শেখের। তাকে মোতালেক কিছু গুড় দেয় ছেলে মেয়েদের খাওয়ার জন্য। বিনা পয়সায় কিছুতেই নেবে না দেখে মোতালেক এক সেরের দাম নিয়ে বাকিটা দিয়ে দেয় বিনা পয়সায়। বাড়িতে সেই গুড় আনায় মাজুখাতুনের রাগ ওঠে ফুলে। স্বামীকে সে শাসিয়ে দেয়, যেন কোনদিন

আর মোতালেফের গুড় না আসে তার বাড়িতে, এমনকি মোতালেফ তার সঙ্গে দেখাও যেন না করে। বেশ কিছুদিন দেখা না হওয়ায় মোতালেফ একদিন নিজেই আসে নাদির শেখের বাড়ী। সঙ্গে রসের দুটি হাঁড়ি। এই অবস্থায় নাদির শেখ ভীত সন্ত্রস্ত। যদি স্ত্রী কিছু খারাপ ব্যবহার করে ফেলে মোতালেফের সঙ্গে। শেষে হুঁকো খাইয়ে মোতালেফকে ঘরে বসার আমন্ত্রণ জানালেও ঘরের ভিতর থেকে মাজুখাতুন কথা শোনাতে কসুর করে না। মোতালেফ নাদির শেখকে দিয়ে মাজুকে জানায় সে মাজু খাতুনকে রস খাওয়াতে আসেনি। এবছর একটি বারও ভাল করে গুড় করে বিক্রি করতে পারেনি। একটু যদি গুড় বানিয়ে দেয় মাজুখাতুন নিজের হাতে, সে বিক্রি করে সুখ পায়, তার এত গাছ বাওয়া সার্থক হয় কিছুটা। মোতালেফের গলার স্বর চাপা অভিমানে গাঢ়। এই কথায় মাজুখাতুনের চোখে নীরব, গোপন অশ্রু। একমাত্র মোতালেফই তা দেখতে পায়। নির্নিমেষ মোতালেফকে দেখে নাদির শেখ যখন হাতের হুঁকোয় আগুন নিভে যাওয়ার কথা মনে করায় তখন মোতালেফের শেষ প্রতীকী বাক্য 'না, মেঞাভাই নেবে নাই।'

গল্পের বিষয়বস্তু তথা কাহিনীর এখানেই শেষ। কাহিনী অংশটি নিছক ছোট নয়। অতীতের কিছু Flashback-এর চিত্রসহ এই গল্পের কাহিনী অংশ দু'বছরের কমবেশি সময়কে ধরে রাখে। কাহিনির আরম্ভ কার্তিকে, মোতালেফের সঙ্গে মাজুখাতুনের বিবাহ এবং মাজুখাতুনকে খেজুররসের সময়ে নিজের ঘরে আনার ঘটনা দিয়ে। এরপরে একে একে ফুলবানুর সঙ্গে মোতালেফের প্রাক্ বিবাহ পর্বের প্রেমের চিত্র, মাজুখাতুনের সঙ্গে তার এই দ্বিতীয় বিবাহের আগে মোতালেফের সঙ্গে বিবাহ বিষয়ে অবতারণার মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম ভাব-ভাবনার সংক্ষিপ্ত ছবি, লেখকের নিজস্ব বর্ণনায় মোতালেফ মাজু খাতুনের সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে মোতালেফের ব্যবসায়িক উন্নতির বর্ণনা, ফুলবানুকে বিবাহ করে ঘরে আনা ও তাদের দুর্দম যৌবন ভোগের, প্রেমের, রূপাসক্তির চিত্রাঙ্কন, মাজুখাতুনের আবার নাদির শেখের বাড়ীর গৃহিণী হয়ে আসার কাহিনি, ফুলবানু-মোতালেফের সম্পর্কে চিড় ধরার পরিস্থিতির চিত্র, শেষে রসের হাঁড়ি নিয়ে নাদির শেখের বাড়ী এসে মোতালেফের মাজুখাতুনের কাছে এক গভীর অন্য স্বাদের প্রেমানুভবে গোপনতম আত্মসমর্পণ — এসব দিয়েই কাহিনীকে একটি সুতোয় ধরা হয়েছে। এখানেই রস গল্পের বিষয়বস্তুর সার্থকতা।

রসগল্পের শিল্প সার্থকতা প্রসঙ্গে বলা যায় — নরেন্দ্রনাথ মূলতঃ রসের কারবারি, নানা

# বিষয় ঃ

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ' রস' গল্পে সাধারণ রোমান্টিক কাহিনির অন্তরালে গভীর মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ।

Scanned with CamScanner